

আল মুহাদ্দিসাত

মুসলিম নারীদের হাদিসচর্চার ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ আকরাম নদভি

ভাষান্তর

মিজান রহমান

মোমতাজুল করিম

মারদিয়া মমতাজ

রাফে সালমান



গাডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

◆ মুখবন্ধ	১৫
◆ ভূমিকা	২৭
◆ মহাযত্ন আল কুরআন ও সুন্নাহর প্রভাববলয়	৩১
◆ কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর অধিকার	৩৬
◆ নারীর নিজ কাজের ফলে প্রতিষ্ঠিত নারীর অধিকার	৪৩

প্রথম অধ্যায় হাদিস বর্ণনার আইনি শর্ত

◆ সাক্ষ্য ও রেওয়ায়েত	৪৮
◆ সাক্ষ্যদান ও রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্য	৫০
◆ নারীর হাদিস বর্ণনার আইনি বৈধতা	৫২
◆ নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রকাশ্য অনুমতি	৫৬
◆ ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদিস	৫৯
◆ অন্য উদাহরণ; আয়িশা (রা.)-এর একটি হাদিস	৬০

দ্বিতীয় অধ্যায় হাদিস অনুসন্ধানকারী ও হাদিসের শিক্ষার্থী হিসেবে নারী

◆ শিক্ষাদানের দায়িত্ব	৬৭
◆ সন্তানদের শিক্ষাদান	৬৯
◆ সন্তানদের সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা	৭২
◆ তরঙ্গী ও নারীদের ইলমি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান	৭৩
◆ নারীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব	৭৪
◆ অনুসরণীয় নারীদের জীবনচরণ	৭৬
◆ নারীদের নিজেদের প্রচেষ্টা	৮০
◆ নারীরা যা জিজ্ঞেস করতেন	৮২
◆ জ্ঞান অর্জনের পথে লজ্জা	৮৪
◆ সাহাবিগণের নিকট নারীদের জ্ঞানার্জন	৮৫
◆ হাদিসের সংরক্ষক হিসেবে নারী	৮৬
◆ বিভিন্ন গ্রন্থে টীকা যুক্তকরণ	৯২
◆ যাচাইকরণ ও সংশোধন	৯৩

তৃতীয় অধ্যায়
হাদিস শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ,
ভ্রমণ, হাদিস শিক্ষার স্থান ও শিক্ষার ধরন

◆ হাদিস শিক্ষার আসর	৯৫
◆ হজ; বিদায় হজ	৯৮
◆ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান	১০২
◆ ভ্রমণ	১১০
◆ হজযাত্রা	১১১
◆ সেকাণে হাদিস শিক্ষার স্থান	১১৫
◆ বাড়ি	১১৬
◆ মসজিদ	১২০
◆ বিদ্যাপীঠ	১২১
◆ হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি	১২৩
◆ সামাআ ও ইজাজার সংরক্ষণ	১২৯
◆ ইজাজার অনুসন্ধান	১৩১
◆ ফাতিমা বিনতে সাদ আল খায়ের (৫২৫-৬০০ হি.)	১৩৩

চতুর্থ অধ্যায়
নারীদের শিক্ষকগণ

◆ পারিবারিক শিক্ষকগণ	১৩৯
◆ স্থানীয় শিক্ষকগণ	১৪৪
◆ মুসাফির শিক্ষকগণ	১৪৫
◆ অন্য শহরের শিক্ষকদের থেকে হাদিস শেখা	১৪৮
◆ শিক্ষকগণের সংখ্যা	১৫০

পঞ্চম অধ্যায়
পড়াশোনার বিষয়

◆ প্রথম তিন শতাব্দী	১৫২
◆ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী	১৫৩
◆ সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী	১৫৮
◆ নবম শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী	১৬৩
◆ চতুর্দশ শতাব্দী	১৬৬
◆ নারীরা যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন	১৬৮
◆ আল মুয়াত্তা	১৬৮

◆ আল জাওয়ামি	১৬৮
◆ আস-সুনান	১৭৩
◆ আল মাসানিদ	১৭৪
◆ আল মাআজিম ও আল মশইখাত	১৭৫
◆ আল আরবায়ুনাহ	১৭৮
◆ আল আজ্জা	১৭৯
◆ আল মুসালসালাত	১৮০
◆ উম্মে হানি বিনতে নুরুদ্দিনের পাঠ্যতালিকা	১৮২

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞান প্রসারে নারীর ভূমিকা

◆ সাহাবিগণ ও তাঁদের পরবর্তী সময়ের আলিমগণ	১৮৬
◆ প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম—যারা নারী সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন	১৮৯
◆ যে সমস্ত স্বামী নিজ স্ত্রীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন	১৯১
◆ যে সমস্ত সন্তান তাদের মায়ের নিকট শিখেছেন	১৯৪
◆ যে সন্তানগণ নিজের মায়ের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন	১৯৬
◆ নারী আলিমগণের কাজের পদ্ধতি	১৯৯
◆ বিনামূল্যে শিক্ষাদান, ছোটো ছোটো উপহার গ্রহণ	২০৫
◆ তাঁদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	২০৬
◆ শুহাদা বিনতে আবু নসর আহমাদ ইবনুল ফারাজ আল বাগদাদিয়ার বিখ্যাত শিক্ষার্থীগণ	২০৭
◆ জয়নব বিনতে কামালের সামাআ ক্রাসের ধারাবাহিকতা	২১১
◆ শিক্ষার্থীদের নাম (জানা থাকা সাপেক্ষে মৃত্যুর তারিখ, সংশ্লিষ্ট স্থান)	২১২
◆ মুহাদ্দিসাতগণ যেভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন	২১৮
◆ শব্দের বর্ণনা	২১৮
◆ শিক্ষককে পড়ে শোনানো	২২৩
◆ চিঠিপত্র আদান-প্রদান	২২৬
◆ ইজাজা	২৩৩
◆ হাদিস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জমায়েত	২৩৩
◆ বাড়ি	২৩৩
◆ মসজিদ	২৩৫
◆ মাদরাসা	২৩৭
◆ অন্যান্য স্থান	২৩৯

সপ্তম অধ্যায়
নারীদের হাদিস ও বর্ণনাসমূহ

◆ সিহাহ সিন্ভায় নারীগণের হাদিস	২৪১
◆ বর্ণনাকারীদের বাগিতা	২৪৬
◆ নারীগণের হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত ফিকহ	২৫৪
◆ সুরাইয়া আল আসলামিয়ার হাদিস	২৫৪
◆ বুশরা বিনতে সাফওয়ান-এর হাদিস	২৫৬
◆ উম্মে আতিয়ার হাদিস	২৫৭
◆ রিফায়া আল কুরাজির স্ত্রীর বিষয়ে আয়িশা (রা.)-এর হাদিস	২৫৭
◆ বিভিন্ন হাদিস সংকলনে নারীদের বর্ণনা	২৫৮
◆ জাওয়ামি	২৫৮
◆ সুনান	২৬২
◆ মুসনাদ	২৬৫
◆ মুয়াজিম ও মাশাহিখাত	২৬৭
◆ আরবাউনাত বা চত্বিশ হাদিস	২৬৯
◆ আজ্জা	২৭০
◆ মুসালাসালা	২৭৪
◆ তাঁদের বর্ণনার প্রাচুর্য	২৭৫
◆ নারীদের বর্ণনাসমূহের সংকলন	২৮২
● মুসনাদে আয়িশা	২৮২
● আল ইসতিযাব লিমা ইসতাদরাকাতহু আয়িশা আলান আসহাব	২৮৩
● মুসনাদ ফাতিমা	২৮৪
● জুজ বিবা	২৮৪
● মাশাহিখা শুহদাহ	২৮৬
● মাশাহিখা খাদিজা	২৮৬
● মাশাহিখা কারিমা	২৮৭
● মাশাহিখা আজিবা	২৮৭
● মাশাহিখা সাইয়্যিদা আল মারানিয়া	২৮৮
● জুজ নুদার বিনতে আবু হাইয়ান	২৮৮
● মাশাহিখা ওয়াজিহা আস-সাইয়্যিদা	২৮৮
● মাশাহিখা জয়নব আস-সুলামিয়া	২৮৯
● জয়নব বিনতে আল কামাল	২৮৯
● মাশাহিখা ফাতিমা বিনতে ইবরাহিম আল মাকদিসিয়া	২৯০

● মাশাইখা জয়নব বিনতে খাববাজ	২৯০
● মুজাম মরিয়ম আন-নাবুলসিয়া	২৯১
● মুজাম মরিয়ম আল আজরাইয়া	২৯১
● মাশাইখা হাসানা আত-তাবারিয়া	২৯১
● মাশাইখা আয়িশা বিনতে ইবনে আবদুল হাদি	২৯১
● মাশাইখা ফাতিমা বিনতে খলিল	২৯২
● মাশাইখা আয়িশা বিনতে আল আলা আল হান্দি	২৯২
● মাশাইখা জয়নব বিনতে আল ইয়াফিয়	২৯৩
● মাশাইখা আসমা আল মাহরানিয়া	২৯৩
● উম্মে কিরাম উনস বিনতে আবদুল কারিমের আরবাউন	২৯৪
● মাশাইখা জাহিদা বিনতে আজ-জাহিরি	২৯৪
● হুমাইদার হাদিস লেখা	২৯৪
● খুনাসা-এর নোট	২৯৪
● মাশাইখা আস-সিন্ত ফাতিমা	২৯৫
● নারী শিক্ষকগণের মাধ্যমে উচ্চতর ইসনাদ লাভ	২৯৫

অষ্টম অধ্যায়

নারীগণ ও হাদিসের সমালোচনা

◆ বর্ণনাকারীগণের মূল্যায়ন	২৯৮
◆ নারী বর্ণনাকারীগণের তাদিল	৩০২
◆ নারী বর্ণনাকারীদের ‘জারহ’	৩০৩
◆ নারীদের হাদিসের মূল্যায়ন	৩০৫
◆ নারী কর্তৃক বর্ণনাকারীদের মূল্যায়ন	৩০৭
◆ ‘তাদিল’ ও ‘জারহ’-এর ব্যাপারে নারীগণের ভূমিকা	৩০৭
◆ নারী কর্তৃক তাদিল ও জারহ-এর উদাহরণ	৩০৮
◆ হাদিস পর্যালোচনায় নারীগণের ভূমিকা	৩১০
◆ হাদিসকে কুরআনের আলোকে যাচাই করা	৩১০
◆ হাদিসকে তার চেয়ে মজবুত হাদিসের সাথে তুলনা করা	৩১১
◆ কোনো হাদিসকে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখা	৩১৩
◆ হাদিসকে এর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে মূল্যায়ন করা	৩১৪
◆ কোনো হাদিসের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, সে আলোকে যাচাই করা	৩১৫
◆ কোনো হাদিসকে অর্থের যথার্থতার আলোকে যাচাই করা	৩১৫

নবম অধ্যায়

স্থান ও কালভেদ : সংক্ষিপ্তসার

◆ ১ম পর্যায় : ১ম ও ২য় হিজরি শতক	৩১৭
◆ ২য় পর্যায় : ৩য়-৫ম হিজরি শতক	৩২০
◆ ৩য় পর্যায় : ৬ষ্ঠ-৯ম হিজরি শতক	৩২৬
◆ ৪র্থ পর্যায় : ৯ম-১৫শ হিজরি শতক	৩৩১
◆ অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনা	৩৩৫
হিজাজ	৩৩৫
ইরাক	৩৩৬
আশ-শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)	৩৩৭
মিশর	৩৩৯
স্পেন ও মরক্কো	৩৪২
খোরাসান ও ট্রান্সজেনিয়া অঞ্চল	৩৪৩
ভারত	৩৪৩

দশম অধ্যায়

ফিকহ ও আমল

◆ নারী আলিমদের ফিকহচর্চা	৩৪৭
◆ কুরআনের জ্ঞান	৩৪৭
◆ হাদিসের জ্ঞান	৩৫১
◆ ফকিহা	৩৫২
◆ ফতোয়া প্রদানকারী নারীগণ	৩৫৪
◆ পুরুষ ও নারীদের মাঝে বাহাল	৩৫৬
◆ নারীদের ফিকহের ওপর ফকিহদের নির্ভরতা	৩৫৭
◆ নারীদের যেসব মতামত নিয়ে অন্যরা বিতর্ক করেছে	৩৫৮
◆ আমল	৩৫৯

মুখবন্ধ

এই বইটিকে আরবি ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত জীবনী অভিধানের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকার অনুবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অভিধানটি ইসলামের ইতিহাসে নারী হাদিসবিশারদদের নিয়ে রচিত। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের অনেকাংশই রূপান্তর ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর প্রাথমিক কারণ হলো—অভিধানের মূল কাজের সঙ্গে তাতে উপস্থাপিত অনেক সামগ্রী (মানচিত্র, রেখাচিত্র, অন্যান্য চিত্র) সংযুক্ত ছিল না বলে সেগুলো প্রয়োজন অনুসারে সংযুক্ত করতে হয়েছে। আরবি পাঠকদের চেয়ে ইংরেজি পাঠকদের প্রত্যাশার পার্থক্যও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। আমি জানি, পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আসবে। ফলে এখানে কিছু ঘোষণা দিয়ে রাখতে চাই। ইংরেজি পাঠকদের প্রত্যাশা নীতিগতভাবে আমাকে বলতে বাধ্য করছে, এই বইটি কী—সেটি ব্যাখ্যার মতো বেমানান কাজের চেয়ে বরং এই বইটি মূলত কী নয়, সেটি বলাই ভালো। সুতরাং শুরু করতে চাই এই বলে—এটি নারী অধ্যয়ন শাস্ত্রের (Women's Studies) ওপর কোনো অনুশীলনমূলক বই নয়। এই বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞও নই। তবে আমার এই অজ্ঞতা স্বীকারকে উদাসীনতা বিবেচনা করাও উচিত হবে না। বরং আশা করি, নারী অধ্যয়ন শাস্ত্রে দক্ষ পণ্ডিতগণ বইয়ে বর্ণিত তথ্যসমূহকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ইসলামি সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান ও যৌক্তিক বিতর্ক উত্থাপনের আগে যেকোনো ব্যক্তিরই প্রচুর পরিশ্রমের দরকার রয়েছে। এর জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও গোড়ার প্রস্তুতিগুলো হলো—

তথ্য নির্বাচন ও বিন্যাসকরণ : অভিধান থেকে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নির্বাচন এবং সেটা সুশৃঙ্খলভাবে একত্র করা এ ধরনের কাজের প্রথম ধাপ। যেমন, আমি এখানে অভিধানে বর্ণিত অন্তত বিশজন নারীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভূরিভূরি তথ্য একত্রিত করেছি। তাঁদের সবার জীবনী স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব। ফাতিমা বিনতে সাদ আল খায়েরের বিষয়ে সামান্য চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে এখানে (বইয়ের পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৯)। অথচ সেজন্য আমাকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে কমপক্ষে অর্ধ ডজন পৃথক পৃথক বইয়ে। এজন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে বটে, কিন্তু অভিধানটি থেকে আপনি অন্তত এই নির্দেশনা পাবেন—ফাতেমা বিনতে সাদ আল খায়ের বিষয়ে পড়াশোনার জন্য আপনি কোন বই দিয়ে শুরু করবেন।

পরিমাণগত বিশ্লেষণ : স্থান, কাল ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক মুহাদ্দিসাতের বর্ণনা এই বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। বইয়ের নবম অধ্যায় মূলত একটি বৃহৎ ছবির চুম্বকাংশ, যা অধিকতর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক পটভূমি : কীভাবে বিভিন্ন স্তরের হাদিস সংগ্রহ এবং পারস্পরিক ভিত্তিতে আদান-প্রদান হয়, সে বিষয়ে এই বইয়ে কিছু রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আলোকপাত করা হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, প্রশাসনিক কাঠামো, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ধরন, আর্থসামাজিক মর্যাদা কীভাবে হাদিস অধ্যয়নকে প্রভাবিত করেছিল, কীভাবে হাদিস সংরক্ষিত হয়েছিল, সেসব ঐতিহাসিক ধারাপরিক্রমার সারনির্যাস।

নির্দিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টিপাত : অনেক মুহাদ্দিসাতের নাম খেয়াল করলেই বোঝা যায়— তাঁদের প্রায় সবার পিতাই ছিলেন কাজি, ইমাম, হাফিজ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধা ও সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত ব্যক্তিবর্গ। এ থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালীন অগ্রসর পুরুষেরা নারী শিক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় নারীদেরকে তাঁদের থেকে কম সম্মানিত মনে করতেন না। যদিও সে সময় সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত হতো রক্ষণশীল ইসলামের মানদণ্ডে এবং মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির গোড়া অ্যারিস্টটল ছিল না; ছিল রাসূলের সুন্নাহ।

নারীর জন্য কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়—এই রকম বিষয়ে মানুষের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের কারণে নারীবিদ্বেষী মতবাদ হিসেবে ইসলামকে প্রায়ই অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে নারী নিগ্রহের ঘটনা থাকার কারণেই অভিযোগটি সত্য হয়ে যায় না, যদি না সত্যিকার অর্থেই ইসলাম নারীবিদ্বেষী হয়। এটা সত্য, বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী নিগ্রহের যথেষ্ট উদাহরণ ও অভিযোগ রয়েছে। তথাপি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ব্যর্থতার জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়; বরং স্থানীয় ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতিফলই সর্বোচ্চ দায়ী। কিন্তু টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্যচিত্রে পাকিস্তানের নারী নিগ্রহের ঘটনাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তুলনামূলকভাবে ভারতের নারী নিগ্রহকে সেভাবে দেখানো হয় না। কেননা, তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপরই নিবদ্ধ।

এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত তরুণীরা পোশাকের পশ্চিমা শৈলীতে নিজেদের ঢেলে সাজাচ্ছে। অপরদিকে পাকিস্তান অথবা খোদ ভারতেরই মুসলিম তরুণীরা সেটা করছে না। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মুসলিমদের মতো তারাও চায় না—মুসলিম মানসে পশ্চিমা আচরণের আঁচ লাগুক কিংবা তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ুক কর্তৃত্ববাদী আধুনিকতার বিষবাষ্প। ইসলামি জীবনাচরণের প্রতি নারীবাদী সমালোচকদের একধরনের উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আগে থেকেই ছিল। ইদানীং অবশ্য কিছুটা হলেও সেটা কমতে শুরু করেছে। মুসলমানরা এই বিদ্বেষ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেয়েছে বলেই স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

একজন বহিরাগত হিসেবে আমার মনে হয়েছে, নারীবাদী অ্যাজেন্ডার দুইটি বিশেষ দিক রয়েছে। একটি ব্যাবহারিক, অন্যটি তাত্ত্বিক। ব্যাবহারিক দিকটি নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রশ্নে সোচ্চার। সমতা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি ইস্যুতে এই ব্যাবহারিক দিক দৃষ্টিপাত করে। ভালো মনের কোনো মানুষই এই অধিকারের প্রশ্নে বিতর্কে যাবেন না। সবার চোখেই ন্যায়বিচার একটি সদৃশ। সদৃশের সংজ্ঞা নির্ধারণ কিংবা তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের কোনো একচ্ছত্র অধিকার নেই; বরং এই সদৃশ ধারণ করে যে নিজেকে আইনত সীমার ভেতরে রাখে,

মুসলমানরা তার প্রশংসাই করে। মুসলমানদের মধ্যে সংকাজের প্রতিযোগিতা রয়েছে। এ বিষয়টি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) সুযোগ্য ছাত্র ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়াহর (মৃত্যু : ৭৫১ হি.) চিন্তাধারা দিয়ে বোধগম্য করা হয়তো কঠিন হবে।^১

একজন শাফেয়ি আলিম বলেন—‘শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তাকে রাজনীতি বলা যায় না।’ শরিয়াহর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলতে যদি এমন কিছুকে বোঝানো হয়—যা শরিয়াহ সমর্থন করে না, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় যদি বলা হয়—শরিয়াহর বাইরে কোনো রাজনীতি হতেই পারে না, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই ভুল হবে। যখন যেখানে যেকোনো উপায়েই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সেখানেই আপনি স্রষ্টার আইন এবং তাঁর নির্ধারিত ধর্মের বিধান খুঁজে পাবেন। ন্যায়বিচার বাস্তবায়নে দৃঢ়তার প্রশ্নে প্রশংসাময় আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। এমনকি একটি সূক্ষ্ম বিষয়েও তিনি ন্যায়বিচার কার্যকরের ব্যাপারে দৃঢ় ও অবিচল। যেভাবে তিনি এ গোটা জগতে আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সরল এবং এ বিষয়ে তিনিই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মূলত চেয়েছেন বান্দাদের জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে দিতে, যাতে সকলের মাঝে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সমতার চর্চা হয়। যে কারও হাত ধরে, যেকোনো পন্থায়ই বাস্তবায়িত হোক না কেন, ন্যায়বিচার সর্বাবস্থায় ধর্মেরই অংশ; এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়।

নারীর প্রতি সীমাহীন অবিচার রোধের সংকল্প বা সদিচ্ছা মুসলিম সমাজে মোটাদাগে গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত। কিন্তু নারীবাদী সমালোচকরা বিষয়টিকে ঘিরে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের মাধ্যমে প্রশ্নের জট পাকিয়ে ফেলেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও এটা মুসলিম চিন্তা-জগৎকে নাড়া দেয় এবং আমার নিকট কিছু প্রশ্ন আসে। প্রশ্নগুলো এমন—যে কাজটি একজন পুরুষ করতে পারে, একজন নারী তা কেন পারবে না? হতে পারে সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া প্রদান, নামাজে ইমামতি, সঙ্গী ছাড়া ভ্রমণ, মাথা না ঢেকেই ধর্মপরায়ণ হওয়া ইত্যাদি। এভাবে নারীর সমঅধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুসলমানদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হয়।

^১ অমুসলিম শাসনের অধীনে মুসলিমদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন বক্তৃতার আলোচনায় ইয়াহিয়া MICHOT-এর অনুবাদটি উদ্ধৃত করছি (২০০৬), ১০৫; অনুচ্ছেদটি আত-তুরক আল হুকমিয়া (সম্পাদনা : এস. উমরান, কায়রো, ১৪২৩/২০০২), ১৭-১৮ থেকে।

ভূমিকা

মানুষজন এটা জেনে চমকে যায়, ইসলামি অনুশাসনের ভেতরে জীবনধারণ করেও একজন নারী চিন্তাবিদও হতে পারেন। সেই চিন্তাচর্চার জগতে নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারেন। ইসলামের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অর্জন করতে পারেন সূক্ষ্ম জ্ঞান। আবার সেই বিষয়ে মতামতও প্রকাশ করতে পারেন। প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিমা জগৎ মনে করে, ইসলামের সামাজিক নিয়মনীতিতে ধর্মের যতটা প্রভাব রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মে ততটা নেই। আর একটা সমাজে ধর্মের প্রভাব যত বেশি হবে, ততটাই হ্রাস পাবে নারী প্রতিনিধিত্ব কিংবা নারীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার সুযোগ।

পশ্চিমাদের এই রকম ধারণার পেছনের কারণ—তারা মনে করে, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি এবং মূলত পুরুষদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। ফলে নারীকে বলিদান করে হলেও পুরুষেরা ধর্ম থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিতে চাইবে। কিন্তু মুসলমানরা কোনোভাবেই এমন ধারণা পোষণ করে না। এর একটা কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—কুরআন আল্লাহর বাণী। যদিও এটি মানুষের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এবং এর প্রথম শ্রোতা রাসূল (সা.) ছিলেন আরবি ভাষাভাষী, তবুও কুরআন মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয় না।

গঠনগত দিক থেকে সামগ্রিক অর্থে কুরআন তথাকথিত সাহিত্যের মতো গল্প বলায় মনোযোগ দেয় না। কারণ, এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবনীভিত্তিক মহাকাব্য নয়। আবার এর নেই কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাও। কোনো নির্দিষ্ট মানব প্রতিষ্ঠান তথা রাজত্ব বা পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিংবা সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ পেশ করা থেকেও কুরআন বিরত থাকে। অন্যদিকে এটি অগোছালো কিংবা গভীরভাবে সংযুক্ত কিছু দুর্বোধ্য নৈতিক, আইনি কিংবা দার্শনিক কাজেরও সমাহার নয়।

বিশ্বাসীদের মতে, মানুষের বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে সরাসরি ঐশী শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যম হলো আল কুরআন। কুরআন মানুষের বাস্তব জীবনের ওপর কিছু নির্দেশনা, কিছু সান্ত্বনা, শক্তির ব্যাপারে সতর্কবার্তা ও পুরস্কারের ব্যাপারে ওয়াদার সমষ্টি। এটি মানুষকে পথ দেখিয়ে দেয়, কীভাবে পরকালীন দীর্ঘস্থায়ী শক্তির জন্য এই পৃথিবীতে একটি সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে—কুরআন হলো এক অদ্বিতীয় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উৎস। জীবন পরিচালনায় নৈতিক উপদেশ ও নির্দেশনার সমষ্টি জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন তাকে এই কর্তৃত্বের অধিকার দেয়, যার প্রতি এটি নাজিল করা হয়েছিল। ফলে কুরআন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহও এ কারণে কর্তৃত্বের হকদার।

ঐশী ওয়াদা মতে—জীবন পরিচালনার এই যুগল উৎসের নির্দেশনা ও কাঠামোর ভেতরে থেকেই বিশ্বাসীরা কেবল আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি অর্জন করতে পারবে। ফলে মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কিছুই করতে পারে না। এই বইটি সেই কর্তৃত্বের জগতে নারীর প্রবেশের এক প্রামাণ্য দলিল।

ওহি ব্যতীত সাধারণ আইনগুলোর বিষয়ে মানুষজন আশা করে—আইন প্রণয়নকারীগণ নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা ‘অন্ধকার পর্দার পেছন থেকে’ তাদের জন্য আইন বা বিধিবিধান নির্ধারণ করবেন। কারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, কারা দুর্ভোগ পোহাবেন, সে বিষয়ে খোদ আইন প্রণয়নকারীরই জানার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। কারণ, সর্বোত্তম মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিও সব সময় পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে মানবিক আইনপ্রণেতারা সব সময় তাদের রগচি ও আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তারা মনে করে—তাদের আগ্রহই দীর্ঘমেয়াদে সকলের উপকার সাধন করবে। তাদের প্রণীত আইন কিছু মানুষের ওপর অন্য মানুষের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। যেমন : গরিবের ওপর বিত্তবানের, নারীর ওপর পুরুষের কিংবা এক জাতির ওপর অন্য জাতির অগ্রাধিকার। তবে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অতীতের ভুল শোধরানো সম্ভব। এটাই এসব আইনের ক্ষেত্রে একমাত্র সান্ত্বনা।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে, কুরআন ও সুন্নাহ অতি নিখুঁতভাবে পক্ষপাতমুক্ত এবং মানবজাতির জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনায় পরিপূর্ণ। কারণ, আল্লাহর জ্ঞান ও দয়া সবকিছুর ভূত-ভবিষ্যৎকে ছেয়ে আছে। ওই ঐশী নির্দেশনা থেকে মানুষের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যাচাইয়ের দরকার হতে পারে, কিন্তু ঐশী নির্দেশনা হিসেবে খোদ কুরআন কিংবা হাদিসকে যাচাই করা নিষ্প্রয়োজন। সেই অনুসারে ইসলামি ঐতিহ্য হলো—কেউ ‘আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন...’ বলার সাথে সাথেই সব বিতর্ক বা যুক্তির অবসান হয়ে যায়।

যেখানে কুরআনের কোনো বিধানকে সরাসরি প্রয়োগ করা যায় না, মুসলমানরা তখন আল্লাহর বার্তা প্রচারক হিসেবে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে রাসূল (সা.) কী করেছেন, সেটি তালাশ করে। আর রাসূল (সা.)-এর কাজের উদাহরণ এখন মুদ্রিত অবস্থায় বর্তমান। এগুলোকে বলা হয় হাদিস বা রাসূল (সা.)-এর বাণী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাহর প্রভাববলয়

নারীর প্রতি নেতিবাচক আচরণের কারণে মহাগ্রন্থ আল কুরআন জাহেলি যুগের মানুষদের তিরস্কার করে বলছে—

‘অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুখবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (এবং ভাবতে থাকে)—সে কি একে (সদ্যপ্রসূত কন্যা সন্তানকে) অপমানসহ গ্রহণ করবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ভালোভাবে শুনে রাখো, (কন্যা সন্তান সম্পর্কে) ওরা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা অতিনিকৃষ্ট।’ সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

কন্যা সন্তানের পেছনে ব্যয়ভারই সম্ভবত কন্যা সন্তানের প্রতি এ ধরনের নেতিবাচক আচরণের কারণ। সাধারণত পেশিশক্তি বৃদ্ধি কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা হিসেবেই পুত্র সন্তান কামনা করা হয়। সে সময় আরব গোত্রগুলোতে কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কুরআন এহেন ঘৃণ্য কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছে এভাবে—

‘যখন জীবন্ত কবর দেওয়া নিষ্পাপ শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সূরা তাকবির : ৮-৯

মানবাধিকার ও মানবিক দায়িত্ব—এই দুটো বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কুরআনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম। নারী-পুরুষ উভয়ই এক আল্লাহর সৃষ্টি। একক ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে তাদের রয়েছে পৃথক পৃথক দায়বদ্ধতা। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে কুরআনে বলেন—

‘হে মানবসম্প্রদায়! তোমার প্রতিপালককে ভয় করো; যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন একক ব্যক্তিসত্তা থেকে। তারপর সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া, সেই জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন সকল নরনারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আত্মীয়তার অধিকার দাবি করে থাকো এবং সম্মান করো তোমাদের জ্ঞাতিসম্পর্ককে।^২ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন।’ সূরা নিসা : ১

‘তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে জোড়া বানিয়েছেন, যেন তার নিকট তোমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারো।’ সূরা আ’রাফ : ১৮৯

^২ ‘ঘনিষ্ঠ আত্মীয়’: ‘আরহাম’ শব্দটি ‘রিহম’-এর বহুবচন; এর অর্থ হলো গর্ভ। তবে এখানে এর আক্ষরিক অর্থ না বুঝিয়ে ‘নিকটাত্মীয়দের’ বোঝানো হয়েছে।

নারী ও পুরুষকে একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

‘মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।’ সূরা জারিয়াত : ৫৬

কুরআনের পারিভাষিক শব্দ ‘আবদ’ দ্বারা আল্লাহর ইবাদতকারী ও আল্লাহর দাস উভয়টিই বোঝায়। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্বপালনের গুণাবলি যে প্রচেষ্টা থেকে আসে, তা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকম। এই বিষয়টি কুরআনের একটি বহুল পরিচিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে সাইবার বর্ণিত একটি হাদিসে সেই আয়াত এবং আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে—

‘নবি করিম (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছি— আমি নবি করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের কথা কুরআনে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের (নারীদের) কেন সেভাবে উল্লেখ করা হয়নি? ওই দিনই রাসূল (সা.) বক্তব্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিস্বারে উঠলেন এবং আমাকে সে খবর দেওয়া হলো। ওই মুহূর্তে আমি মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। (খবর শুনে) আমার চুল বেঁধে ফেললাম এবং আমাদের বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলছেন—হে মানুষগণ! আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ কুরআনে বলেছেন—“মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ, রোজাদার নারী, যৌন অঙ্গসমূহের হেফাজতকারী পুরুষ, যৌন অঙ্গসমূহের হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ তাআলাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ, আল্লাহ তাআলাকে অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।”^৩

এই পৃথিবীতে পালনীয় কর্তব্য এবং পরকালে তার জবাবদিহিতার বিষয়ে দায়িত্বের ভার প্রত্যেককেই নিজ নিজ কাঁধে বহন করতে হবে। মানুষের দক্ষতা, দায়িত্বের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন জীবের প্রতি নির্ধারিত কর্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা এমন কোনো দায়িত্ব নির্ধারণ করেন না, যা পালনের ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়নি।

ইসলামের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমরা এমন কোনো ঐতিহ্য খুঁজে পাইনি, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মাধ্যম হতে হয়েছে; বরং আল্লাহর দাসত্ব কিংবা দুনিয়াবি বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মাঝেই সমাধান নিহিত। কুরআন ও সুন্নাহর জগতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের সদস্য কিংবা নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হতে হয় না। এক্ষেত্রে নারীর ওপর পুরুষের বিশেষ কোনো প্রাধান্য নেই। এজন্য অর্জন করতে হয় না কোনো সামাজিক মর্যাদাও। যেমন, কুরআন চর্চার বিষয়ে গরিবের ওপর মনিবের কোনো অগ্রাধিকার নেই। এটি হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর অধিকার

সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করত—ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া ঐশী বাণী। এর বিরুদ্ধাচরণ করা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। কুরআন নারীদের সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ে কথা বলে এবং নারীত্বকে কোনোভাবেই হীন কিংবা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখে না। আদিম পাপ অথবা পাপের আধার হিসেবে নারীকে বিবেচনা করার প্রবণতাও কুরআনে নেই। ইসলাম এমনটাও মনে করে না, অন্যদের পাপের দিকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে নেই, আছে কেবল নারীদের মধ্যে। ইসলামে নারীকে পুরুষের একটা উপাঙ্গ বা লেজুড়বিশেষ হিসেবেও দেখা হয়নি; বরং বিবেচনা করা হয়েছে পুরুষের মতোই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে।

যেসব প্রেক্ষাপট থেকে নারীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়া কুরআনে নারীকে নির্দেশ করতে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনিতে ব্যাকরণে সরাসরি নারীর সম্পৃক্ততার দরকার হয় না; বরং ব্যাকরণে অনেক সময় কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করাটাও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমি আগেই সূরা আহজাবের ৩৩-৩৫ নং আয়াত উল্লেখ করেছি। সেখানে নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক গুণ বর্ণিত হয়েছে। পরের আয়াত থেকে শুরু করে এখানে আরও কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো—

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন সে ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজস্ব কোনো এখতিয়ার নেই।’ সূরা আহজাব : ৩৬

‘আমি নর-নারী নির্বিশেষে কারও কাজই কখনো বিনষ্ট করব না।’ সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

‘পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই যথার্থ মুমিন অবস্থায় (অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে) কোনো নেক কাজ করবে, তাকে দুনিয়ার জীবনে পবিত্র জীবনযাপন করা এবং আখিরাতের জীবনেও তাকে দুনিয়ার জীবনের কাজের জন্য উত্তম বিনিময় দান করব।’ সূরা নাহল : ৯৭

‘নর কিংবা নারী, যে-ই কোনো ভালো কাজ করবে, সে ঈমানদার অবস্থায় ভালো কাজ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ সূরা নিসা : ১২৪

‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন।’ সূরা তাওবা : ৭১

কিছু বিষয় রয়েছে, যেখানে অবশ্যই নারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। যেমন : বিবাহ ও তালাকবিষয়ক নৈতিক ও আইনি নির্দেশনা, মায়ের প্রসববেদনা উল্লেখ করে পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে নারীত্বের সরাসরি উল্লেখ থাকাই সংগত। (যেমন : সূরা লোকমান :

১৪, সূরা আহকাফ : ১৫)। কিন্তু যেখানে নারী আলোচনার মূল বিষয়ই নয়, কখনো কখনো কুরআনের সেসব স্থানেও নারীকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবার্তা এবং বিভিন্ন ঐশী অঙ্গীকার পুরুষদের মতোই নারীর ওপর সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। নারী বলে পুরস্কার অথবা শাস্তি পুরুষদের তুলনায় কিছু কমও নয় কিংবা বেশিও নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ঈমানদারদের জন্য কুরআন হলো সেই যোগসূত্র, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যা ঐশী নির্দেশের কার্যকর সেতুবন্ধন রচনা করে। নারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত—এমন বহুল পরিচিত একটি ঘটনা হচ্ছে সূরা মুজাদালা নাজিলের প্রেক্ষাপট। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, খাওয়ালা বিনতে সালাবাহ (উবাদা ইবনে সামিতের ভাই আউস ইবনে সামিতের স্ত্রী) থেকে বর্ণনা করেন—

‘একদিন আমার স্বামী আমার ঘরে এলেন এবং বিরজিকর কিছু বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেন। আমি তাঁকে প্রত্যুত্তর দিতে থাকলাম। একপর্যায়ে তিনি বললেন—তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো। (আরব সমাজে স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনার বিষয়টিকে তালাকের চেয়েও কঠিন ভাবা হতো, এটি ছিল স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকৃতি জানানোর একটি পন্থা।)

অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটি মজলিশে বসলেন। তারপর আবার ঘরে ফিরে এসে আমাকে কাছে পেতে চাইলেন; কিন্তু আমি নিজেকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। আর তিনি জোড় করে আমাকে নিকটে টেনে নিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিলাম। অতঃপর একজন দুর্বল নারী যেভাবে জয়ী হয়, আমি সেভাবে পরিস্থিতি মুকাবিলা করে তাকে সামলে নিলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম—যাঁর হাতে খাওয়ালার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমার হাত ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না আমাদের বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে কোনো ওহি নাজিল হয়। অতঃপর আমি রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম এবং অভিযোগ করে জানতে চাইলাম—এই বিষয়ে আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। রাসূল (সা.) বললেন—সে (আউস ইবনে সামিত) তোমার স্বামী এবং চাচাতো ভাই। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওহি নাজিল করলেন—

“যে নারীটি তাঁর স্বামীর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে যাচ্ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথা শুনেছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উভয়ের কথাও শুনেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন এবং দেখেন।” সূরা মুজাদালাহ : ১

পঞ্চম অধ্যায় পড়াশোনার বিষয়

নারীরা কী পড়তেন, তা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হতো; এমনকি একই শহরে দুটো প্রতিষ্ঠানে কিংবা দুটো ভিন্ন যুগে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। ফলে তাদের পড়াশোনা নিয়ে একটা সন্তোষজনক সারাংশ দেওয়া কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও ইসলামি বিশ্বের প্রাথমিক যুগোত্তর সময়ে পড়াশোনার পাঠ্যবিষয় এবং নারীর পড়াশোনার একটা সাধারণ চিত্র উপস্থাপন করা হলে, তা উপকারে আসতে পারে ভেবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা বিভিন্ন জনপ্রিয় হাদিসগ্রন্থের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছি।

প্রথম তিন শতাব্দী

আরবে ইসলামপূর্ব যুগে গৃহকর্মের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল মূলত মৌখিকতানির্ভর। কবিতা আবৃত্তি, বাগ্মিতা ও অশ্বচালনাবিদ্যার মধ্যেই তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকত। লেখার দক্ষতা তাদের ছিল না বললেই চলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াত চর্চা করার পাশাপাশি তারা হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে থাকে। অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞানে অনেক দক্ষ ও নিবেদিত হয়ে ওঠেন। ফলে তারা বিচারক ও মুফতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারা লেখা ও বক্তৃতায় প্রশিক্ষিত হন এবং অনেকেই বাগ্মিতায় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

প্রথম তিন শতাব্দীতে নারী-পুরুষ কারও জন্যই ইসলামি শিক্ষার কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। সে সময় ছাত্ররা প্রকাশভঙ্গির যে বিভিন্ন রীতির আশ্রয় নিতেন, সেগুলোই হয়ে উঠেছিল শিক্ষার ভাষা। অতি সূক্ষ্ম অর্থে আরবি ব্যাকরণ বলতে আমরা যা বুঝি, তার উন্নয়ন শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে ভাষাগত ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে আরবি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় আলি ইবনে আবু তালিবের খিলাফতের সময় থেকে। বিশিষ্ট পণ্ডিত আল মুবাররিদের (মৃত্যু : ২৮৫ হি.) মতে, সম্ভবত একজন নারীর কারণে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তায় আসে। তিনি বলেন—আল মাজিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন—

‘ব্যাকরণের ভিত্তি নির্মাণের কারণ হলো আবুল আসওয়াদের (মৃত্যু : ৬৯ হি.) কন্যা। সে একবার পিতার নিকট মা আশাদ্দাল হাররা (কী গরম পড়েছে) বলতে গিয়ে বলে ফেলল—মা আশাদ্দাল হাররি (তাপের সবচেয়ে দুঃসহ প্রভাব কী)? জবাবে আবুল আসওয়াদ বললেন, পৃথিবীর শিলাখণ্ডগুলো উত্তপ্ত হয়ে যায়! তখন কন্যা বলল—আমি বলতে চেয়েছি, অনেক

গরম পড়েছে! এরপর আবুল আসওয়াদ বিষয়টি আলি (রা.)-কে জানালেন। এরপর আলি (রা.) তাঁকে কিছু মৌলিক নিয়ম বলে দিলেন। এটাকে ভিত্তি ধরে আবুল আসওয়াদ পরবর্তী সময়ে তা সম্প্রসারণ করেন।^৪

ভাষা আয়ত্ত করার পর অথবা ভাষা আয়ত্ত করার পাশাপাশি নারীরা কুরআনের দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত শেখা, কুরআন মুখস্থ করা এবং এর অর্থ উপলব্ধির দিকে নজর দেন। এরপর তাঁরা হাদিস পড়া, মুখস্থ করা এবং বর্ণনা শুরু করেন। মেধায় যারা অধিক যোগ্যতর ছিলেন, তাঁরা আরও সূক্ষ্মভাবে হাদিস সংগ্রহ করা, বর্ণনা করা, সনদে রাবিদের চিহ্নিত করা, সুন্নাহর বিভিন্ন বিষয় শেখা ও বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দেন।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী

চতুর্থ শতাব্দী থেকে পাঠ্যক্রম সুসংঘবদ্ধ করা শুরু হয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে এসে উজির নিজামুল মুলক কিয়ামুদ্দিন আবু আলি আল হাসান ইবনে আলি ইবনে ইসহাক আত-তুসির (৪০৮-৮৪ হি.) হাত ধরে তা আরও উন্নত হয়। একজন চৌকশ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসক হিসেবে তিনি যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি জ্ঞানপিপাসু হিসেবেও ছিলেন সমাদৃত। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছিলেন। একই সঙ্গে বাগদাদ, নিশাপুর ও তুসে প্রতিষ্ঠা করেন অনেক বড়ো বড়ো বিদ্যাপীঠ। তিনি মারুউ, হেরাত, বলখ, বসরাসহ বিভিন্ন জায়গায় অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ‘নিজামি’ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমের মধ্যে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যার সাথে ব্যবহারিক বিজ্ঞান; যেমন : গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও এই বিষয়গুলো কেবল প্রাথমিক স্তরে পড়ানো হতো।

নারী চিন্তাবিদগণের জীবনী অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে আমি ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দীর নারীদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এই সময়ের নারীরা আরবি ভাষা পড়া, বলা ও লেখার দক্ষতা দিয়ে তাঁদের অধ্যয়ন শুরু করতেন। একই সময়ে তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত ও মুখস্থ করতেও শিখতেন। অনেকেই অতি অল্প বয়সে কুরআন মুখস্থ করে ফেলতেন। উদাহরণস্বরূপ, ফাতিমা বিনতে আলি ইবনে মুসা ইবনে জাফর আত-তাওসিয়া আল হুসাইনিয়ার (হিজরি ৫ম শতাব্দী) কথাই ধরা যাক। তিনি ৯ বছর বয়সের আগেই কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর পিতার (মৃত্যু : ৪৬৪ হি.) নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন।^৫

ব্যাকরণ অবশ্যজ্ঞাবীভাবে ২য়-৩য় শতাব্দী থেকেই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল; যদিও আমরা প্রাথমিকভাবে চতুর্থ শতাব্দীর একজন নারী বিশেষজ্ঞের সূত্র জানতে পারি। তিনি হলেন ইয়েমেনের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জামাল উদ্দিন আলি ইবনে আবু ফাওয়ারিস আল হামদানির (৪র্থ শতাব্দী) স্ত্রী মরিয়ম বিনতে জাহাশ। তিনি তাঁর স্বামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন, যা তাঁর পরিপক্ব মানসিকতা ও জ্ঞানের নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি মুরজি নামের খারেজিদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ তর্কে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

^৪ আজ-জাহাবি, সিয়রু আলামিন নুবালা, iv. ৮৩

^৫ উমর রিদা কাহালাহ (মৃত্যু : ১৪০৭ হি.), আলামুন নিসা, iv. ৮৬

মুরজিরা বিশ্বাস করত, ঈমান হলো হৃদয়ের ভেতরের বিষয় এবং কেউ একজন মুখে যা-ই বলুক বা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে যেকোনো (পাপ) কাজই করুক, হৃদয়ের ঈমানই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট। একবার একটা বিতর্ক অনুষ্ঠানে মুরজিরা সূরা আ'রাফের ৪০ নম্বর আয়াতের শেষাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি যুক্তি তুলে ধরে—

‘অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য কখনো আসমানের (রহমতের) দুয়ার খুলে দেওয়া হবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ একটি সুচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করে।’

মুরজিরা যুক্তি দেখায়—‘যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে সুচের ছিদ্র দিয়েও উটকে প্রবেশ করাতে পারেন।’ জামাল উদ্দিন আলি ওই যুক্তি শোনার পর বাড়ি ফিরে আসেন এবং মুরজিদের যুক্তি নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান। ভাবনায় তাঁর চোখে ঘুম আসছিল না। অবস্থা দেখে স্ত্রী মরিয়ম কী ঘটেছে তা জানতে চায়। তিনি মরিয়মের নিকট ঘটনাটি খুলে বলেন। সব শুনে মরিয়ম বলেন—‘কুরআনের ওই আয়াতে উট হলো (ক্রিয়ার) কর্তা; কর্ম নয়।’ তখন তাঁর স্বামী বুঝতে পারেন, মুরজিদের জবাবে তাদের কী বলতে হবে। অতঃপর তিনি প্রশান্ত মনে ঘুমিয়ে যান। পরদিন সকালেই তিনি তাঁর মুরজি বন্ধুর নিকট যান এবং তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন। এই অকাট্য যুক্তি শুনে মুরজিরা নির্বাক হয়ে যায়।^৬

ষষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞান প্রসারে নারীর ভূমিকা

নারীদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা নিজেদের জ্ঞানকে প্রসারের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই কাজ করেছেন। এটা ঠিক যে, হাদিসের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন পুরুষ, কিন্তু নারী শিক্ষকদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন পুরুষ। এসব সংখ্যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু সংখ্যাটা ছিল অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ : আজ-জাহাবি, হাফিজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে নাজ্জারের (মৃত্যু : ৬৪৩ হি.) বিষয়ে ইবনে সাআতি থেকে বর্ণনা করেন—‘ইবনে নাজ্জারের ৩০০০ পুরুষ ও ৪০০ নারী শিক্ষক ছিলেন।’^৭ রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে নারীর কর্তৃত্ব কত প্রবল ছিল এবং সাহাবিগণ, তাবয়িগণ, প্রখ্যাত ইমাম ও কাজিগণ কীভাবে নারী শিক্ষকগণের ওপরও নির্ভরশীল ছিলেন, তা এই ছোট তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয়।

সাহাবিগণ ও তাঁদের পরবর্তী সময়ের আলিমগণ

সাহাবিদের মধ্যে যারা আয়িশা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তাঁরা হলেন—তাঁর পিতা আবু বকর, উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আবু মুসা আল আশআরি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, রাবিয়া বিনতে আমর আল জুরাসি, সাইব ইবনে ইয়াজিদ, আমর ইবনুল আস, জায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানি, আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নওফেল (রা.)-সহ আরও অনেকে।

এ ছাড়াও হাদিসের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলোতে তিনশতেরও অধিক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যারা আয়িশা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে তাঁদের হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করে আল মিজি আক্ষরিক ক্রমানুসারে তাঁদের তালিকা করেছেন।^৮

উম্মে সালামা (রা.) থেকে যেসব পুরুষ বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উসমান ইবনে জায়েদ ইবনে হারিসা আল কালবি, আল আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ আন-নাখয়ি, হাবিব ইবনে আবু সাবিত, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জাকওয়ান আবু সালাহ আস-সামমান, সাইদ ইবনে আবু সাইদ আল মাকবুরি, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সোলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবু ওয়াইল শাকিক ইবনে সালামা আল আসাদি, আমির আশ-শাবি, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল আসলামি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দিক, আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে জামাহ, আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে

^৭ আজ-জাহাবি, সিয়রু আলামিন নুবালা, xxui. ১৩৩

^৮ আল মিজি, তাহজিবুল কামাল, xxv. ২২৮-৩৩

উরবা, উরওয়া ইবনুল জোবায়ের, আতা ইবনে আবু রাবাহ, আতা ইবনে ইয়াসার, ইকরিমাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম, ইবনে আব্বাসের মনিব কুরাইব, মুজাহিদ ইবনে জাবির আল মক্কি, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে হুসাইন, মাসরুক ইবনুল আজদা, ইবনে উমরের মনিব নাফি, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবু উসমান আন-নাহদি।^৯

হাফসা (রা.) হতে যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন—হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল খুজায়ি, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম, আবু বকর ইবনে সোলায়মান ইবনে আবু খাইসামাহসহ আরও অনেকে।^{১০}

রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য নারীগণের থেকেও সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানের জগতে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আলি ইবনে আবু তালিব রাসূল (সা.)-এর দাসী মাইমুনা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।^{১১} দুররা বিনতে আবু লাহাব থেকে আলি (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন—

‘কোনো মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করার মাধ্যমে কোনো জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।’^{১২}

পরবর্তী যুগে উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বর্ণনা করেন—

‘উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী ন্যায়পরায়ণ নারী খাওলা বিনতে হাকিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) দুই হাতে তাঁর কন্যার দুই সন্তানকে ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন—“আল্লাহর কসম! তোমাদের কারণে কেউ বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করে (তুজাহিলুনা), কেউ ভীতুর জীবনযাপন করে (তুজাব্বিনুনা), কেউ কৃপণের জীবনযাপন করে (তুবাখখিলুনা); তবু তোমরা কেউ কেউ বেহেশতের ফুলের মতো (মর্যাদাবান)।”’^{১৩}

মহান তাবেয়ি সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিবও খাওলা বিনতে হাকিমের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমির আশ-শাবি রাইদাহ বিনতে কারামাহ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।^{১৪}

^৯ প্রাগুক্ত, ৩১৭-১৯

^{১০} প্রাগুক্ত, ১৫৪

^{১১} প্রাগুক্ত, ৩১৩

^{১২} ইবনে আবদুল বার, আল ইসতিয়াব, ii. ৭২৬

^{১৩} ইবনে বিশকাওয়াল, গাওয়ামিদুল আসমা আল মুবাহহামা, i. ২৭২-৭৩

^{১৪} ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ ফিত-তাময়িজিস সাহাবা, iv. ২৯৯

নারীদের হাদিস ও বর্ণনাসমূহ

এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করছি নারী সাহাবিগণ কর্তৃক বর্ণিত কিছু হাদিস, সিহাহ সিভায় যেগুলোর সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। এই হাদিসগুলো কেবল নারীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। আর এই বর্ণিত হাদিসগুলো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলোর ওপর ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নির্ভর করে। এরপর আলোচনা করব, প্রধান হাদিস সংকলনগুলোর ব্যাখ্যা এবং এর প্রচারকার্যে নারীদের ভূমিকা। অধ্যায়ের শেষের দিকে থাকবে নারীগণ কর্তৃক বর্ণনার বিষয়ে যেসব লেখালিখি হয়েছে, তার একটি জরিপ। একই সঙ্গে নারীদের বর্ণিত হাদিস ও বর্ণনার ব্যাপারে আলিমগণের আগ্রহের বিষয়টিও তুলে ধরা হবে।

সিহাহ সিভায় নারীগণের হাদিস

সিহাহ সিভার মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সমস্ত হাদিস অন্তর্ভুক্ত নেই এবং হাদিসের সকল পুরুষ-নারী বর্ণনাকারীর নামও নেই। এতৎসত্ত্বেও এই কিতাবগুলো এতটা স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, অন্য কোনো কিতাবই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাই শুরুতেই এই কিতাবগুলোর ব্যাপারে কিছু বলে নেওয়া উচিত। সিহাহ সিভায় যে সকল নারীর হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা ছিলেন সাহাবি, তাবয়ি ও পরবর্তী প্রজন্মের; যারা দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুহাদিসাতদের অভিধানে আমি ২০০০ সাহাবির নাম উল্লেখ করেছি। তাঁদের মধ্যে ১৩০ জনের বর্ণিত হাদিস সিহাহ সিভায় সংকলিত হয়েছে। কারও একটি বা দুটো হাদিস সিহাহ সিভায় স্থান পেয়েছে। আবার কারও শত শত হাদিস। ইমাম বুখারির ‘জামেউস-সহিহ’ গ্রন্থে ৩১ জন নারী সাহাবির বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম শরিফে ৩৬ জন, আবু দাউদে ৭৫ জন, তিরমিজিতে ৪৬ জন, আন-নাসায়িতে ৬৫ জন এবং ইবনে মাজাহর ৬০ জন নারী সাহাবির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্ণনাকারীর মোট সংখ্যা তাবয়িন এবং তাঁদের পরবর্তীগণসহ প্রায় ১২০০। তাঁদের মধ্যে ১৩০ জন সিহাহ সিভায় স্থান পেয়েছেন। সিহাহ সিভায় নারীদের বর্ণিত হাদিস স্থান পেয়েছে মোট ২৭৬৪টি। এর মধ্যে ২৫৩৯টি হাদিস নারী সাহাবিদের থেকে বর্ণিত।

নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিষয়বস্তুর পুরুষ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিষয়বস্তুর মতোই। কিছু হাদিসের বর্ণনাকারী নারী ও পুরুষ উভয়ই; কিছু হাদিসের বর্ণনাকারী হয় নারী, না হয় পুরুষ। একজন নারী বর্ণনাকারী বিভিন্ন বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন—এমন নজিরও রয়েছে। ওপরে বর্ণিত জরিপে আয়িশা (রা.)-কে বাদ দেওয়া হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত, তিনি বহুল পরিচিত। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা হাদিসের সমালোচনা এবং ফিকহ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেবল নারী বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের আলোচনা পৃথক শিরোনামে করা হয়েছে।

ঈমান অধ্যায়ে অনেক হাদিস কেবল নারী বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সু'দা আল মুররিয়ার বর্ণিত হাদিস তাঁর সন্তান ইয়াহইয়া ইবনে তালহার বর্ণনার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। সে উদাহরণ ইতঃপূর্বে দেখানো হয়েছে।

পবিত্রতা অধ্যায়ে নারী সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিষয়ে রয়েছে একক নারী কর্তৃক হাদিস বর্ণনার দৃষ্টান্তও। যাহোক, বিশেষ বিষয় ছাড়াও সাধারণ বিষয়ে নারী বর্ণনাকারীগণ এ অধ্যায়ে প্রচুর হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর-রু'বায়ি বিনতে মুয়াবিদ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যিনি রাসূল (সা.)-এর অজু বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনেক হাদিসবিশারদ দূরদূরান্ত থেকে মুয়াবিদের নিকট হাদিস শেখার জন্য এসেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকিল ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—‘আলি ইবনে হুসাইন (জয়নুল আবেদিন) আমাকে আর-রু'বায়ি বিনতে মুয়াবিদের নিকট রাসূল (সা.)-এর অজু সম্পর্কে জানার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি (মুয়াবিদ) এ বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বলেছেন। এও বলেছেন—তোমার চাচাতো ভাই (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাসও আমাকে রাসূল (সা.)-এর অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।’^{১৫} আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি এবং নবিজির চাচাতো ভাই এবং আলি জয়নুল আবেদিন, যিনি নবিজির পরনাতি বা আলি ও ফাতিমা (রা.)-এর নাতি এবং মহান সাহাবি। তাঁরা উভয়ই মুয়াবিদের নিকট রাসূল (সা.)-এর অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

সালাত অধ্যায়ে নামাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে নারীগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে সালাত বিষয়ে সূর্যগ্রহণের নামাজবিষয়ক কেবল একটি হাদিস উল্লেখ করছি। হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর স্ত্রী ফাতিমা থেকে, ফাতিমা তাঁর দাদি আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণনা করেন—

‘একদিন রাসূল (সা.)-এর জমানায় সূর্যগ্রহণ হলো। আয়িশা (রা.) যেখানে বসে নামাজ পড়ছিলেন, আমি সেখানে প্রবেশ করে বললাম— মানুষ নামাজ পড়ছে কেন? তিনি মাথা আকাশের দিকে ওঠালেন। বললাম—এটি কি কোনো নিদর্শন? তিনি ইশারা করলেন, হ্যাঁ। পরে তিনি নামাজের বিবরণ দিলেন।’^{১৬}

জানাজার বিষয়ে একটি হাদিস তিনটি বংশপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। উম্মে ঈসা আল জামার, তিনি উম্মে জাফর বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বিন আবু তালিব থেকে তিনি তাঁর দাদি আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণনা করেন। সেখানে বলা হয়েছে—

‘যেদিন (আমার স্বামী) জাফর ও তাঁর সাথীগণ শহিদ হলেন, সেদিন সকালবেলায় আমি উঠলাম। রাসূল (সা.) আমার নিকট এলেন। আমি ৪০টি চামড়া পাকা এবং আটার খামির তৈরি করলাম। এরপর আমার ছেলেদের মুখ ধোয়ালাম এবং তেল মাখিয়ে দিলাম। রাসূল (সা.) আমার নিকট এসে ডাকলেন—“হে আসমা! জাফরের ছেলেরা কোথায়?” আমি

^{১৫} আবু দাউদ, তাহারায, বাব সিফাত ওদুইন নাবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; তিরমিজি, তাহারায, বাব মাআ আল্লাহ ইয়াবদাউ বি মুআখ্খার আর-রাস; ইবনে মাজাহ, তাহারায, বাব আল রাজুল ইয়াস্তাইনু আলা ওদুইহি ফা-ইয়াসুব্বা আলাইহি

^{১৬} বুখারি, তাহারায, বাব মান লাম ইয়াতওয়াদা ইল্লা মিনাল-গাশিয় আল মুসকিল; মুসলিম, সালাহ, বাব মাউরিদা আলান নাবি সাল্লা ল-লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম ফি সালাতিল কুসুফ

ওদেরকে তাঁর নিকট আনলাম। তিনি ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁদের গন্ধ নিলেন। তাঁর চোখে ছিল পানি। তিনি কাঁদছিলেন। বললাম—“হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! জাফর সম্পর্কে আপনার নিকট হয়তো কোনো খবর এসেছে?” তিনি বললেন—“হ্যাঁ, সে আজ-শহিদ হয়ে গেছে।”

আমি দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম আর নারীগণ আমার পাশে ভিড় করছিল। এরপর রাসূল (সা.) বলতে থাকলেন—“হে আসমা! তুমি কোনো অযাচিত বাক্য বলিয়ো না আর বুক চাপড়িয়ো না।” এরপর রাসূল (সা.) তাঁর মেয়ে ফাতিমার নিকট গেলেন। তখন তিনি “ও আমার চাচা!” বলে কাঁদছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন—“জাফরের ভালোবাসায় যে কাঁদবে, সে কাঁদুক।” এরপর তিনি বললেন—“জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। কারণ, তাঁরা এখন শোকাচ্ছন।”^{১৭}

সিয়াম বা রোজার ওপর নারীদের বর্ণিত বেশ কিছু হাদিস রয়েছে। আবু আইয়ুব বলেন—

‘একদিন রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিসের নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি রোজা রেখেছেন। রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি কি গতকাল রোজা ছিলে? তিনি বললেন, না। নবিজি বললেন, তুমি কি আগামীকাল রোজা রাখবে? তিনি বললেন, না। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তোমার রোজা ভেঙে ফেলো।’^{১৮}

এ ঘটনা থেকে আলিমদের মত হচ্ছে, লোকজন জমায়েত হওয়ার দিনে; যখন মানুষ একে অপরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে, সেদিন নফল রোজা রাখার অনুমতি নেই।

^{১৭} ইবনে মাজাহ, জানাইজ, বাব মা জাআ ফিত-তামাম ইউবআসু ইলা আহলিল মায়িত

^{১৮} বুখারি, সাওম, বাব সাওমি ইয়াওমিল জুমুআ

দশম অধ্যায় ফিকহ ও আমল

এই শেষ অধ্যায়ে আমি হাদিস সম্পর্কিত সমগ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। মুহাদ্দিসগণের বেশির ভাগই যে বিষয়টিতে সতর্ক ছিলেন, তা হচ্ছে—বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদিসের সহিহ নুসুস প্রচার। তবুও ‘তারা হাদিস শেখাতেন’ অথবা ‘হাদিস বর্ণনা করতেন’ ইত্যাদির মতো বাক্যাংশগুলো আধুনিক পাঠকের নিকট সম্ভবত প্রকৃত বার্তাকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। অর্থাৎ, তাঁরা মূলত কোন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন বা তাঁদের উদ্দেশ্য কেমন ছিল, তা স্পষ্ট হয় না।

মূল ব্যাপার হলো—এই প্রচেষ্টার পেছনের অনুপ্রেরণাকে উপলব্ধি করতে পারলে একজন অমুসলিমও তাত্ত্বিকভাবে কতগুলো ভাষ্যকে নির্ভুল হিসেবে গ্রহণ করতে এবং অন্যের নিকটও নির্দিধায় বলতে পারতেন। একটি কার্যকর ইসলামি সমাজব্যবস্থার এই যোগ্যতা কেবল এই তাত্ত্বিক দৃঢ়তা ও সক্ষমতা থেকেই জন্ম নেয় না; বরং তা গড়ে ওঠে আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের সাথে ধার্মিকতা ও সৎকর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ এই সমন্বয় হলো ফিকহ ও আমলের মধ্যে সমন্বয়।

ফিকহ হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা। ফিকহ মূলত মুমিনদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর বিধিবিধান ও মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। আমল (আক্ষরিক অর্থ-কর্ম, অনুশীলন) দ্বারা বোঝানো হয় বিধানে যা আছে, তা কর্মে বাস্তবায়ন। ফিকহের শক্তি কেমন, তা কেবল কতগুলো পৃথক বিধান বা ফিকহের বিশেষ কিছু অধ্যায়ের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে না; বরং এই শক্তি নির্ভর করে বিধানগুলোর মধ্যকার সুসংবদ্ধতা, ঐকান্তিকতা ও সংহতির ওপর।

এক্ষেত্রে ফিকহি জ্ঞানে সংকীর্ণতা আমলের মাঝে বিকৃতি ঘটাতে পারে। যেমন : ধরা যাক এক ব্যক্তি ইসলামের সামগ্রিক সামাজিক জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সে নামাজ ও মসজিদে উপস্থিতির মতো কিছু বিষয়ে বিস্তারিত বিধিবিধান জানে। এর বাইরে সে জানে না ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনটি অনুমোদিত, কোনটি নিষিদ্ধ। সে এটাও জানে না, নামাজ ও মসজিদে নারীদের পোশাক ও ব্যবহারের বিধান কেমন, আর লেনদেন ও জনসমাগমে তাদের বিধান কেমন এবং সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য কতটুকু। সে যদি এই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে নারীদের ব্যবসায় বা অন্য কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেয়, তাহলে তা সংকীর্ণ ও অস্বস্তিকর। ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে ‘ব্যবসায়ের’ জায়গায় আমরা ‘জ্ঞান অন্বেষণ’ অথবা অন্য কোনো বিষয় দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি, যেগুলো দ্বীন কর্তৃক তাদের জন্য অনুমোদিত, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসিত।

একটা সমৃদ্ধ ও প্রশস্ত ফিকহ মানুষের আমলকেও সমৃদ্ধ ও প্রশস্ত করে। যাতে ব্যক্তি ও সমাজ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইসলামের সীমার মধ্যে থেকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সাজাতে পারে। এর বিপরীতে একটি সংকীর্ণ মূলনীতিকে ইসলামের নামে অধিষ্ঠিত করলে জীবনের বাকি অংশ ধীরে ধীরে অনৈসলামিক নীতি দ্বারা অধিকৃত হয়। এই মূলনীতিটি তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রকে উৎসাহিত এবং উম্মাহর সামগ্রিক সংহতিকে ধ্বংস করে। এর মাধ্যমে ফিকহি বিধান একধরনের পরিচয়ের প্রতীক বা চিহ্ন হিসেবে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে পারে।

ফিকহ ও আমল এমন দুটো স্তম্ভ, যাদের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কোনো একটি সমাজ সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের স্বীকৃতি দেয়। যেমন : স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সাহাবিগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, জায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-সহ অন্যদের। পরবর্তী প্রজন্মের বেলায়ও এই একই মানদণ্ডে যাচাই না করে নীতিনির্ধারক হিসেবে কারও আনুগত্য স্বীকার করা হয়নি। যেমন : সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আলকামা, আল আসওয়াদ, হাসান আল বসরি, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, ইবরাহিম নাখয়ি, আতা ইবনে আবু রাবাহ, আমির আশ-শাবি, হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান, আবু হানিফা, আল আওজায়ি, সুফিয়ান আস-সাওরি, মালেক, আল কাজি আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানি, আশ-শাফেয়ি, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমুখ মনীষীদের নীতিনির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে তাঁদের ফিকহি পাণ্ডিত্য ও আমলের মধ্যে সমন্বয়কে মূল মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো—এই ধরনের নেতৃত্ব কি শুধুই পুরুষদের মধ্য থেকে গঠিত হয়েছিল এবং তাতে নারীদের কি কোনো অংশই ছিল না? উত্তরটি হলো—‘না’। আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বেশ কয়েকজন নারীর উদাহরণ দিয়েছি, ফিকহ ও আমলের ক্ষেত্রে যাদের দখল ছিল তাদের সামসময়িক পুরুষ নীতিনির্ধারকদের দ্বারা স্বীকৃত। এই অধ্যায়ে আমি মূলত সেই সময়কালের নারীদের উদাহরণগুলোতে মনোনিবেশ করেছি। কারণ, তাঁরা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারী আলিমদের ফিকহচর্চা

ফিকহের আরও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা হলো—আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত ঐশী বিধিবিধানের জ্ঞান। সুতরাং আমাদের অবশ্যই দ্বীনের এই সকল প্রাথমিক উৎসের ওপর নারী আলিমদের দখল কেমন ছিল, সেই আলোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে।